

সবার জন্য শিক্ষা-স্বাস্থ্যের রাজনৈতিক বিন্দু



মামুনুর রশীদ

মামুনুর রশীদ

প্রকাশ: ২৭ জুলাই ২০২৬ | ১১:০৪ | আপডেট: ২৭ জুলাই ২০২৬ | ১১:০৫



স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সমাজতন্ত্রের বাতাস লেগেছিল তীব্রভাবে। তখন দুটি স্লোগান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল- সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য স্বাস্থ্য। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যাংক-বীমা, বড় বড় কলকারখানা রাষ্ট্রের মালিকানায় চলে এসেছিল। যদিও বেশি দিন বিষয়গুলো টেকেনি। ক্রমান্বয়ে সবই ব্যক্তিমালিকানায় রূপান্তরিত হয়েছে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য আংশিকভাবে এখনও রাষ্ট্রীয় মালিকানায়। শিক্ষায় ব্যাপকভাবে ব্যক্তি মালিকানা ঢুকেছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট ইংরেজি-বাংলা স্কুল এবং প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ঢুকে গেছে। এগুলোতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। শিক্ষাক্রম আমাদের সংবিধানের মতোই এত কাটাকাটি ও পরিবর্তন হয়েছে যে, শিক্ষক ও ছাত্ররা দিশেহারা। এই সুযোগে ঢুকেছে কোচিং ব্যবসা।

শিক্ষা এখন রাজনৈতিক আন্দোলনেরও অংশ। বিশেষত অন্তর্বর্তী শাসনামলে অটোপাস, শিক্ষার্থীদের সচিবালয় দখল, শিক্ষকদের ওপর হামলায় শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। একের পর এক কমিশন গঠন হলেও শিক্ষার মৌল আদর্শটাই হারিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত দুর্নীতি ও রাজনীতিকীকরণ শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। এখান থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনাও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা ধরনের আন্দোলন ও রাজনীতির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ শিক্ষার শান্ত সমাহিত ব্যবস্থাকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছে।

শাসকগোষ্ঠী নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রাখার স্বার্থে বড় বড় পদে নিজেদের লোক নিয়োগ করে ছাত্র রাজনীতির অবাধ অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারা মাঝেমাঝেই এমন সব বক্তব্য দিয়ে থাকে, যা মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক পথ না দেখিয়ে হুংকারে পরিণত হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভালো স্কুল-কলেজের সংখ্যা কম। কিন্তু কিছু বিদ্যালয় যে একেবারেই সীমাহীন অতল গহ্বরে রয়ে গেছে, তাও রীতিমতো আশঙ্কাজনক। পঞ্চাশ, ষাট এবং সত্তরের দশকে একটি গ্রামের স্কুলের সঙ্গে শহরের স্কুলের পার্থক্য আকাশ-পাতাল ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে দেখা যেত তাদের শিক্ষার মান উনিশ-বিশ হতো বটে, কিন্তু ছাত্ররা তা নিজেরাই উন্নত করতে পারত। কিন্তু এখন তা একেবারেই অসম্ভব।

আবার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যবধান ব্যাপক। এসব স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের মানস কাঠামোতে জাতীয় চিন্তা-ভাবনার বিষয় একেবারেই ভিন্ন। এতগুলো ভিন্ন ধরনের এবং বৈষম্যমূলক শিক্ষার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে কোনো প্রকার জাতীয় ঐক্য গঠন করা সম্ভব কিনা, তাতে বড় সন্দেহ জাগে। সবার জন্য শিক্ষা মানে যে বৈষম্যহীন শিক্ষার স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, তা এতদিনে প্রায় অন্তর্হিত।



একদা অভিভাব ও শিক্ষকরাও সর্বজনীন শিক্ষার কথা ভাবতেন। ভাবতেন বলেই ষাটের দশকে একটা শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল এবং তারা দেশপ্রেমিকও। গত শতাব্দীর ৩০-এর দশক পর্যন্ত ছাত্রদের যদি জিজ্ঞেস করা হতো, পড়ালেখা কেন করছ? তার জবাবে আসত- দেশের কাজ করব বলে। সেই দেশের কাজ বিভিন্ন পেশা থেকে করা সম্ভব এবং সেই সম্ভবটা হয়েছিলও। এখন দেশের কাজ তুচ্ছ হয়ে গেছে। ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষাই এখন মুখ্য হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে সবার জন্য স্বাস্থ্য বিষয়টিও এখন মুখ্য বিষয় নয়। শিক্ষা যেমন সুদূরপ্রসারী বিষয়, সে ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য একেবারেই তাৎক্ষণিক ও জরুরি। স্বাস্থ্যের জন্য যে সরকারি অবকাঠামো আছে তা অপ্রতুল। এর সুযোগ বিস্তৃত করার পরিবর্তে নানাভাবে সংকুচিতই হয়েছে। এর মধ্যেও ঢুকে গেছে প্রাইভেটাইজেশন। বিপুল সংখ্যায় হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠেছে সারাদেশে। বিষয়টি এত লাভজনক যে, চিকিৎসক ও পুঁজি লগ্নিকারকরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মানুষদের ভরসার স্থল ছিল সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ। সেসব জায়গায় তারা চিকিৎসা পেত এবং স্বল্প মূল্যে রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা করাতে পারত। এই সেবা কারণে-অকারণে দুপ্রাপ্য হয়ে উঠলে বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি মানুষ ঝুঁকতে শুরু করল। সেই রোগীদের ভিড়ে নিম্নবিত্ত মানুষও নিজেদের সহায়-সম্মল বিক্রি করে ওই ব্যক্তিমালিকানাধীন রোগ নির্ণয় কেন্দ্র ও হাসপাতালে বাধ্য হয়ে যেতে শুরু করল। এখানে যারা চিকিৎসা দিয়ে থাকেন তারাও সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যয় সরকারি হাসপাতালের চেয়ে কয়েক গুণ। কিন্তু অসহায় মানুষের সেখানে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। অনেক পরিবারকেই দেখা যায় চিকিৎসা করাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। এমনকি ভিটেমাটি বিক্রি করে ফেলেছে।

করোনার সময়ে দেখা গেছে, অ্যাম্বুলেন্সগুলোর মালিকানায়ও হাসপাতালের কর্মচারী এবং ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা। পাবলিক হাসপাতালে প্রতিনিয়ত দেখা যায় প্রাইভেট হাসপাতালের দালালরা বিভিন্ন ওয়ার্ড ও কেবিনে ঘোরাঘুরি করছে। তারা অপেক্ষমাণ রোগীকে প্রলুব্ধ করছে।

সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকরা কিছুতেই গ্রামাঞ্চল বা মফস্বলে যেতে রাজি নন। কারণ সেখান থেকে উচ্চশিক্ষা এবং উপযুক্ত পোস্টিংয়ের তদবিরের ব্যবস্থা নেই। এমনকি উপজেলা এবং গ্রামীণ কাঠামোতে তাদের কাজ করার সুযোগও সীমিত। যে মেধাবী ছেলেমেয়েরা চিকিৎসক হওয়ার জন্য যেসব পরীক্ষা এবং বাস্তব জ্ঞানের সম্মুখীন হয়ে আসে, তাদের পক্ষে সম্মানজনকভাবে কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

অন্যদিকে নানা ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবশালীরা ব্যক্তি মালিকানায় হাসপাতাল/ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। সেখানে পড়ালেখা এবং চিকিৎসা দুটিতেই বিপুল অর্থ প্রয়োজন।

এসব অবশ্য সবারই জানা। কিন্তু সমস্যাগুলো সমাধানে যে রাজনৈতিক চেতনা এবং অঙ্গীকার প্রয়োজন, সে ধরনের রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হয় না। রাজনীতির সঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান, এর সমাধান এ জন্যই সম্ভব হয় না। যারা একটু বিত্তবান তারা এ দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অগ্রহণযোগ্য মনে করে বিদেশে চলে যান। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাও চলে যায়।

এই ব্যবস্থার পরিবর্তনে স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই যে ধরনের অঙ্গীকার সৃষ্টি করা প্রয়োজন, তা সম্ভব হয় না। কারণ একটা পর্যায়ে গিয়ে সবকিছুই অর্থের মূল্যমানে বিচার হয়। পাবলিক হাসপাতালে রোগীরা রীতিমতো করুণার পাত্র। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরাই যখন ক্লিনিক বা প্রাইভেট হাসপাতালে বসেন তখন হয়ে যান অন্যরকম।

এর মধ্যেও কিছু চিকিৎসক আছেন যারা প্রাইভেট প্র্যাকটিসই করেন না। সরকারি হাসপাতালের বিধি মেনে তারা একেকজন সেবার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে, বিশাল স্বাস্থ্যব্যবস্থায় এই সংখ্যালঘুরা কোনো কিছু রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম নন।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মৌল আদর্শের মধ্যে যে সমাজতান্ত্রিক ভাবনাটি ছিল, তাতে চিকিৎসকরাও একসময় অংশ নিয়েছিলেন। কেমন করে সব উল্টাপাল্টা হয়ে গেল সময়ের ব্যবধানে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। চিকিৎসকদের মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলি এবং দক্ষ ও ভালো চিকিৎসকরা কেউ দলবদ্ধ হয়ে যান। আবার কেউ দক্ষতা সত্ত্বেও কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ভালো চিকিৎসকদের কোনো অবস্থাতেই দলীয় বিবেচনায় দেখা অনুচিত। আশা করি, একটি বৈষম্যহীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা আমাদের দেশে গড়ে উঠবে, যা হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মৌল আদর্শের প্রতিফলন।

মামুনুর রশীদ: নাট্যব্যক্তিত্ব